ধা রা বা হি ক

রম্যং রুচিরম্

ভজনানন্দে ব্রজের রাখাল স্বামী ব্রহ্মানন্দ

স্বরাজ মজুমদার

স্বামী ব্রহ্মানন্দ যে মাঝে মধ্যে গান করতেন, সে-বিষয়ে কিছু দৃষ্টান্ত পাওয়া যায়।

১। শ্রীম শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃতে জানিয়েছেন, ১৮৮৭ খ্রিস্টাব্দের ২১ ফেব্রুয়ারি শিবরাত্রির দিন রাজা মহারাজ বরানগর মঠে স্বামী শিবানন্দের সঙ্গে 'তাথৈয়া তাথৈয়া নাচে ভোলা' গেয়েছিলেন। গানটি কিছুদিন আগে স্বামীজী রচনা করেন। শুধু গাওয়া নয়, গান গাইতে গাইতে তাঁরা দুজন নেচেওছিলেন।[১৮]

২। স্বামী বামদেবানন্দের সূত্রে আমরা জেনেছি বহুকাল ভ্রমণের পর ১৮৯৪ খ্রিস্টাব্দে মহারাজ ও মহাপুরুষ মহারাজ আলমবাজার মঠে ফিরেছিলেন। মঠে এসে মহারাজ বেশিরভাগ সময় ধ্যানজপেই ডুবে থাকতেন। ''কখনও-কখনও আবেগভরে গান গাইতেন—'ডুব ডুব ডুব রূপসাগরে আমার মন। তলাতল খুঁজলে পাবি, পাবিরে সেই রত্নধন'।''[১৯]

৩। মহারাজ তখন বেলুড় মঠে। এক ভক্ত লিখেছেন, চায়ের টেবিলে বসে একদিন তিনি গেয়েছিলেন—'বনকুসুমের মধুর সৌরভে তোমায় রাখিব সখা হে।' ভক্তটি সাল ও সময়ের উল্লেখ করেননি।[২০]

৪। স্বামী বাসুদেবানন্দ লিখেছেন : ''দক্ষিণেশ্বরে আর একদিন এইরূপ [মহারাজের ভাব সমাধি] দেখেছিলুম। নাটমন্দিরে—মাঝখানে মহারাজ, একদিকে মহাপুরুষ মহারাজ এবং অপরদিকে রামলালদাদা। আমরা এক পাশে দাঁড়িয়ে। মহারাজ রামলালদাদাকে বললেন, 'ঠাকুর, যেমন এখানে দাঁড়িয়ে গাইতেন ও নাচতেন , দাদা, তেমনি করে গান।' হাত নেড়ে রামলালদাদা শ্রীশ্রীভবতারিণীর দিকে তাকিয়ে গান ধরলেন, 'কে নাচে সমরে বামা, তিমিরবরণী। শোণিতসায়রে যেন ভাসিছে নীলনলিনী॥' মহারাজ ও মহাপুরুষ মহারাজ ঠিক সেইরূপ অনুকরণ করতে লাগলেন। গান গাইতে গাইতে একবার করে শ্রীশ্রীজগদম্বার দিকে এগিয়ে যান, আবার ধীরে ধীরে পিছিয়ে আসেন। তিনজনেরই সে কী ভাবের অভিব্যক্তি!''[২১] অর্থাৎ সমবেতভাবে গাইলেও মহারাজের গানটি বিলক্ষণ জানা ছিল; তিনি নাচতে নাচতে তা গেয়েওছিলেন।

রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ সাহিত্যের স্বনামধন্য লেখক, রামকৃষ্ণ মিশন ইনস্টিটিউট অব কালচার থেকে প্রকাশিত Bulletin-এর প্রাক্তন সহকারী সম্পাদক

৫। স্বামী সম্ভবানন্দ জানিয়েছেন : ''মহারাজের ব্যাঙ্গালোরে বাসকালে আমি একেবারে তাঁর পাশের ঘরটিতেই ছিলাম। ভোর চারটায় উঠে তাঁর কলঘরে যাবার শব্দ শুনতে পেতাম। সাধারণত এ সময় তিনি কোন ভজন গুনগুন করে গাইতেন। সেই মৃদুস্বর প্রায় শোনাই যেত না, কিন্তু গানগুলি এমন ভক্তি-প্লুত স্বরে গাওয়া হতো যে শ্রোতামাত্রই রোমাঞ্চিত হয়ে উঠত।''[২২]

৬। 'মুসাফির' ছদ্মনামে [খুব সম্ভব মহারাজের অতি ঘনিষ্ঠ এক সন্ন্যাসী] এ-সম্পর্কে খুব মূল্যবান কিছু তথ্য দিয়েছেন। তাঁর বর্ণিত দুটি গানের ঘটনা ঘটেছিল বেলুড় মঠে এবং একটি কাশীতে। তাঁর বর্ণনা : ''দেখিলাম দোল পূর্ণিমায় সুরধুনীতীরে বেলুড় মঠের আঙ্গিনায় ভক্তজন মাঝে প্রেমে ও ভাবে বিহ্বল হইয়া—'আজ হোলি খেলবো শ্যাম তোমার সনে' এই গীত গাহিতে গাহিতে বাহু তুলিয়া ভক্তগণের মন মাতাইয়া যেন সাক্ষাৎ নদীয়ার নিমাই আবার আসিয়া নৃত্য করিতেছেন। [অপর একদিন] দেখিলাম সহস্র সহস্র লোকের মধ্যে দাঁড়াইয়া 'আর কেন মন এ-সংসারে, যাই চল সেই নগরে'—এই গীত গাহিতে গাহিতে কালী-কীর্তনে ভক্তিগদগদ চিত্তে নৃত্য করিতেছেন এবং তাঁহার সেই অপূর্ব ভাবে সহস্র সহস্র লোক মুগ্ধ হইয়া আনন্দ পুলকিত হইয়া উঠিতেছে।... [আর একবার] দেখিলাম কাশীধামে সন্ন্যাসিগণের সম্মুখে রুদ্রাক্ষমালা হস্তে শিবের প্রেমে মত্ত হইয়া 'বেলপাতা নেয় মাথা পেতে' গীত গাহিতে গাহিতে যেন সাক্ষাৎ শঙ্কর রূপ ধারণ করিয়া নৃত্য করিতেছেন।''[২৩]

৭। স্বামী ব্রহ্মানন্দের গাওয়া আর একটি গানের সুবিদিত ঘটনার উল্লেখ করে অন্য প্রসঙ্গে যাব। ঘটনাটি ঘটে কাশীতে, ১৯১২ খ্রিস্টাব্দে। শ্রীশ্রীমা তখন 'লক্ষ্মীনিবাস'-এ বাস করছেন। ব্রহ্মানন্দজী অদ্বৈত আশ্রম থেকে রোজ 'লক্ষ্মীনিবাস'-এ এসে গোলাপ মার কাছ থেকে জেনে নিতেন মা কেমন আছেন। একদিন সকালে তিনি এলে দোতলার বারান্দা থেকে গোলাপ-মা বলেন, ''রাখাল, মা জিজ্ঞেস করেছেন, আগে শক্তিপূজা করতে হয় কেন?'' মহারাজের উত্তর : ''মার কাছে যে ব্রহ্মজ্ঞানের চাবি। মা কৃপা করে চাবি দিয়ে দোর না খুললে যে আর উপায় নেই।'' এই বলে তিনি বাউলের সুরে গান ধরলেন: ''শঙ্করী-চরণে মন মগ্ন হয়ে রও রে। মগ্ন হয়ে রও রে, সব যন্ত্রণা এড়াও রে॥'' সম্পূর্ণ গানটি গাইতে গাইতে ভাবোন্মত্ত হয়ে তিনি নাচতে লাগলেন এবং গান শেষ হওয়া মাত্র 'হো, হো, হো' বলে হাসতে হাসতে চলে গেলেন। সন্তানের এই নাচ-গান দেখে-শুনে মা খুব আনন্দ প্রকাশ করেছিলেন।[২৪]

এখন প্রশ্ন, মহারাজ গান শিখলেন কোথায়? কার কাছে? তাঁর জীবনীগ্রন্থগুলিতে কোথাও এর উল্লেখ নেই। তাই এখানে অনুমানের সাহায্য নিতেই হয়। সর্বপ্রথম যে-কথাটি মনে হয় তা এই, দীর্ঘ কয়েকবছর তিনি শ্রীরামকৃষ্ণের কাছে থেকেছেন এবং তাঁর অমৃতবর্ষী কণ্ঠে সুর-তাল-সমন্বিত গান সকাল-সন্ধে প্রায় প্রতিদিনই শুনেছেন। শুনেছেন রামলালদাদা এবং বহু খ্যাতনামা গায়কের গাওয়া গান যাঁরা ঠাকুরের কাছে এসে তাঁকে নিত্য গান শোনাতেন। দ্বিতীয়ত, দীর্ঘদিন তিনি অভিন্নহৃদয় নরেন্দ্রনাথের ভক্তিমূলক ও ধ্রুপদি গান শুনেছিলেন—প্রথম যৌবনে এবং পরে বরানগর মঠের তপস্যাপর্বে। তৃতীয়ত, ব্রাহ্মসমাজের গায়কদের গানও প্রথমে তাঁদের সমাজে এবং পরে দক্ষিণেশ্বরে বহুবার শুনেছেন। শৈশবের স্বাভাবিক সংগীতপ্রীতি এইসবের সম্মিলিত প্রভাবে পুষ্ট হয়েছিল সন্দেহ নেই। চতুর্থত, সর্বোপরি অবতারের অন্তরঙ্গ পার্ষদ ও ঈশ্বরকোটি ভক্তের নৃত্যগীতময় ব্রজলীলার সংস্কার শ্রীরামকৃষ্ণ-পরিমণ্ডলে পুনর্বার জাগ্রত হয়েছিল। না হলে সুর সম্পর্কে তাঁর অসম্ভব জ্ঞান ও সংগীতের মর্মমূলে প্রবেশ করে তার

রসাস্বাদন ক্ষমতার অন্য কোনও ব্যাখ্যা পাওয়া যায় না। তাঁর স্নেহধন্য স্বামী মুক্তেশ্বরানন্দও এই প্রশ্ন তুলে বলেছেন, ''ভিতরের সহজাত অনুভূতিই কি বাহিরের সঙ্গীত বুঝিবার শক্তি তাঁহাকে দিয়াছিল?''

বাস্তবিক, সংগীত ভাললাগা এবং তার সমঝদার হওয়া—এ-দুটি এক বস্তু নয়। মহারাজের দুটি গুণই ছিল। স্বামী প্রভানন্দ যথার্থ মন্তব্য করেছেন—''সঙ্গীত ছিল তাঁর আধ্যাত্মিক জীবনের অঙ্গস্বরূপ, তাঁর জীবন-সঙ্গীতের সঙ্গতের ন্যায়।''[২৫]

সংগীতের সমঝদার ও সুররসিক

অবতারদের, বিশেষত রামকৃষ্ণ অবতারের সবকিছুই অদ্ভুত। তাঁর অন্তরঙ্গ পার্ষদদেরও তাই। তা না হলে বিধিমতের সংগীতশিক্ষা না করেও স্বামী ব্রহ্মানন্দ কী করে সংগীতের অত উঁচুদরের রসবেত্তা হয়েছিলেন? তাঁর গভীর সুরজ্ঞানের উৎসটি কী? ভিতরের ওই সহজাত অনুভূতি। সংগীত, তা সে ভজন-কীর্তনই হোক, স্তবস্তুতিই হোক, অথবা ধ্রুপদি সংগীতই হোক, সে-সম্পর্কে তাঁর চিন্তাভাবনা জানতে পারলে আমরা ওই উৎসটি অনুধাবন করতে পারি।

মহারাজ বলতেন, ''বাইরে কিছুই নেই, সবই ভিতরে। বাইরের গান কিছুই নয়। ভিতরে এমন মধুর গান শুনতে পাওয়া যায় যে, সব জুড়িয়ে যায়। ঠাকুর পঞ্চবটীতে ধ্যান করতে করতে বীণার ধ্বনি শুনতে পেতেন।''[২৬]

একদিন এক বিখ্যাত গায়কের আলাপ শুনেই মহারাজ ভাবস্থ হয়েছিলেন। অনেকক্ষণ পর আলাপ থামতে এক ভক্ত অসন্তুষ্ট হয়ে অভিযোগ করলেন—সবই তো হল, কিন্তু ভক্তিমূলক গান তো কিছু হল না! তাতে মহারাজ গম্ভীর হয়ে বললেন : ''শব্দ যে ব্রহ্ম, তাও কি জান না?''[২৭]

পূর্ববঙ্গে জিতেন দত্তের বাড়িতে সুসঙ্গের মহারাজাকে একদিন তিনি কথাপ্রসঙ্গে বলেছিলেন, ''আপনি সঙ্গীত সাধনা করেন, খুব ভাল কথা। এর মধ্য দিয়েও ভগবানের নিকট যাওয়া যায়। এই সুরই নাদ-ব্রহ্ম। তপস্যা করলে এই সব অনুভূতি হবে।''[২৮]

স্বামী শ্যামানন্দ বলেছেন, ''আমাকে মহারাজ বলতেন, 'নাম করতে করতে মেতে যাবি। যা করবি তুই আর ঠাকুর—ধ্যানজপ করিস আর ভজনসাধনই করিস। মানুষ যে কেউ শুনচে বা দেখচে, বা তোর ভুলভ্রান্তি হচ্ছে, এসব কিছু ভাববি নি—একেবারে মেতে যাবি, ডুবে যাবি।' ''[২৯]

স্বামী মুক্তেশ্বরানন্দকে মহারাজ বলেছিলেন, ''শুধু ভাসাভাসা নাম করলে হবে কী, ভজনে মেতে যেতে হবে—নামসাগরে ডুব দিতে হবে, তবে তো! যত তাঁর নাম করবে তত আনন্দ পাবে, তত ভরসা বিশ্বাস আসবে, সন্দেহ অবিশ্বাস দূরে পালিয়ে যাবে।''[৩০]

আর একদিন সেবক বরদানন্দকে কয়েকটি গান গাইতে বলায় তিনি গাইলেন। গান শেষ হলে মহারাজ তাঁকে বললেন, ''ঈশ্বরের নামোচ্চারণ ও মহিমাকীর্তন করতে করতে যার চিত্তে আনন্দধারা অনুক্ষণ প্রবাহিত হয়, সে-ই ধন্য। তাঁকে সর্বদা স্মরণ কর এবং তোমাদের জীবন সার্থক কর; নয়তো এই মানব-জন্ম বৃথা।''[৩১]

স্বামী ব্রহ্মানন্দের সুরজ্ঞান কীরকম তীক্ষ্ণ ও সূক্ষ্ম ছিল তার একটু পরিচয় দিই। ১) একদিন রাতে বেলুড় মঠে মহারাজ একজনকে জিজ্ঞেস করলেন : ''হ্যাঁ রে, হারমোনিয়াম বাজিয়ে কে গান করছে রে?'' তিনি উত্তর দিলেন : ''ও সুজ্জি।'' [স্বামী নির্বাণানন্দ]। মহারাজ বললেন, ''নিয়ে আয় তো ওকে ডেকে।'' তারপর গায়ককে দেখেই বললেন, ''তুই গতকালও গান করেছিলি, তোর বেসুরো রাগিণী শুনে আমার সমস্ত রাত ঘুম হয়নি। হারমোনিয়ামটা আমার খাটের নীচে রেখে দে।''[৩২]

২) এই নির্বাণানন্দজীই জানিয়েছেন,

''ব্রহ্মানন্দজী মঠে থাকলে ভিজিটিং রুম-এ কালীকীর্তন হত, তিনি বারান্দায় বসে মন দিয়ে শুনতেন। গান গাইবার ত্রুটি হলে তিনি দরজার ভিতর দিয়ে মাথা গলিয়ে বলতেন, 'এরকম করে গাচ্ছিস কেন? তোরা কি নেশা করেছিস?' আবার গান ভালো হলে চোখ বুজে উপভোগ করতেন এবং হাত দিয়ে তাল দিতেন।''[৩৩]

৩) মহারাজের সম্ভবত সব থেকে প্রিয় গায়ক স্বামী অম্বিকানন্দ [নীরদ মহারাজ] স্মৃতিচারণ করতে গিয়ে লিখেছেন : ''একদিন গান হচ্ছে। অমূল্য [স্বামী শঙ্করানন্দ] আমায় বলল সুরটা চড়িয়ে দিতে। আমি scale-টা চড়িয়ে দিলাম। সকলে পারে না follow করতে। মহারাজ 'উঃ' করে উঠলেন। বললেন, 'এ কী হলো?' আমি বললাম, 'মহারাজ অমূল্য বলল সুরটা চড়াতে, তাই scale-টা চড়িয়ে দিয়েছি।' মহারাজ বললেন, 'কেন তুই ওরকম করলি? ওর কথা কেন শুনলি? ও কী জানে?' মহারাজ একটু বিরক্ত হলেন।''[৩৪]

৪। মহারাজকে একজন গান শোনাচ্ছিলেন। কিছুক্ষণ শোনার পর মহারাজ গায়ককে বলেন, ''একটু গৌড় মিশিয়ে গাও।'' বাস্তবিক গায়ক সারঙ্গ রাগে গাইছিলেন। তিনি তো মহারাজের সুর সম্পর্কে অভিজ্ঞতা দেখে মুগ্ধ! তিনি তখন গৌড়-সারঙ্গে গান ধরলেন।[৩৫]

৫) মহারাজ একটা অভিনয় দেখতে গেছেন। নাটকের একটি গান শুনে সেবক বরদানন্দকে প্রশ্ন করে বসলেন, ''ভবানী, এটা কী সুর?'' বরদানন্দ উত্তর দিলেন, ''মহারাজ, মনে হচ্ছে এটি সোহিনী।'' মহারাজ বললেন, ''হ্যাঁ।''[৩৬]

৬) ১৯১৬ খ্রিস্টাব্দের একটি ঘটনা। একদিন স্বামী অম্বিকানন্দ 'শঙ্করা' রাগে একটি গান গাইছিলেন। যখন পরে মহারাজের সঙ্গে তাঁর দেখা হল, মহারাজ তাঁর গানের খুব তারিফ করলেন। বললেন, ''আজ বেহাগটি বেশ গাইলে নীরদ।'' শঙ্করা ও বেহাগ—এ-দুটি রাগের মধ্যে সামান্য একটু পার্থক্য আছে। মহারাজের কথা থেকে অম্বিকানন্দ বুঝলেন নিশ্চয় তাঁর কিছু ভুল হয়েছে, নাহলে মহারাজ ওই কথা বলবেন কেন! পরে তিনি ভেবে দেখলেন—হ্যাঁ, ঠিক তাই! শঙ্করার পরিবর্তে তিনি বেহাগেই গেয়েছিলেন। স্বামী ব্রহ্মানন্দের সুরজ্ঞান এতটাই গভীর ছিল।[৩৭]

৭) স্বামী সারদানন্দের সংগীত সম্বন্ধে যথেষ্ট জ্ঞান ছিল। কণ্ঠস্বর একটু মিহি হলেও তিনি ভাল গাইতে পারতেন। সেই তিনিও স্বামী বিবেকানন্দের গাওয়া কিছু গান রপ্ত করে ব্রহ্মানন্দজীকে শোনাতেন, যাতে তাঁর গান স্বামীজীর গায়কী ও সুর থেকে কোনওভাবে বিচ্যুত হয়েছে কী না বুঝতে পারেন। মহারাজের কান এতটাই তীক্ষ্ণ ছিল যে সামান্য বিচ্যুতি দেখলেই বলে দিতে পারতেন। এই কারণেই শরৎ মহারাজ তাঁর বরিষ্ঠ গুরুভ্রাতার কাছে গানের পরীক্ষা দিতেন।[৩৮] মহারাজের অভিমতের ওপর তাঁর এতটাই আস্থা ছিল।

বস্তুত স্বামী বিবেকানন্দকে বাদ দিলে স্বামী ব্রহ্মানন্দের মতো এত গভীর সংগীতপ্রীতি আর কোনও গুরুভাইয়ের ছিল না। এই প্রীতির একটি মস্ত পরিচয়, তিনি যখন যেখানে থাকতেন এমন কিছু সেবক-সন্ন্যাসীদের তাঁর কাছে রাখতেন, যাঁরা ভাল গান জানতেন অথবা স্তবস্তুতি পাঠে দক্ষ ছিলেন। তাঁদের অনেককে আবার তিনি উৎসাহ দিয়ে, পরামর্শ দিয়ে নানাভাবে সাহায্য করে তৈরিও করেছিলেন, যেমন তাঁর সভাগায়ক অম্বিকানন্দকে। তাঁকে তিনি মুর্শিদাবাদের কাশিমবাজারে গিয়ে উচ্চাঙ্গ সংগীত শিখতে উৎসাহিত করেন। বিখ্যাত গায়ক রাধিকাপ্রসাদ গোস্বামীর কাছে আট বছর সংগীতের তালিম নিয়েছিলেন অম্বিকানন্দ। এই রাধিকাপ্রসাদ অদ্বৈত গোস্বামী বংশের সন্তান ছিলেন এবং শ্রীরামকৃষ্ণকে ১৮৮৪ খ্রিস্টাব্দে দর্শন করেন। সেদিন (১৯ সেপ্টেম্বর) ঠাকুর তাঁকে শ্রীগৌরাঙ্গ-

বিষয়ক দুটি গানও শোনান। কর্ণাটকে থাকার সময় নির্বাণানন্দজীকে কর্ণাটকী সংগীত শিক্ষার প্রেরণাও দিয়েছিলেন মহারাজ। স্বামী বরদানন্দ, শ্যামানন্দ, মুক্তেশ্বরানন্দকেও মহারাজ সুন্দরভাবে ভজন-কীর্তন ও স্তবাদি আয়ত্ত করতে নিরন্তর উৎসাহিত করতেন।

ভজন-কীর্তন ও উচ্চাঙ্গ সংগীতের প্রতি তাঁর এই অদম্য উৎসাহের পেছনে ছিল নিরন্তর ঈশ্বরের স্মরণ-মনন ও ধ্যানজপের তীব্র প্রবাহকে বহমান রেখে চারপাশে ব্রহ্মানন্দের অটুট আবেষ্টনী সৃষ্টি করে নিজে তা আস্বাদন করা, এবং অন্যদেরও সেই আনন্দ আস্বাদনে উদ্বোধিত করা। তিনি যখন 'যেখানে থাকতেন' সেখানেই সুরলোকের এই অমরাবতী রচিত হত এবং এক অতি উচ্চ আধ্যাত্মিক ভাবস্পন্দনে সমগ্র পরিমণ্ডলটি স্পন্দিত হত। ভজনানন্দের এই ঘনীভূত মূর্তি ও তার রসগ্রাহিতা বড় বড় গাইয়ে-বাজিয়েকে তাঁর কাছে আকর্ষণ করে আনত। সেইসব দিনের কথা স্মরণ করে স্বামী অভয়ানন্দ [পূজ্যপাদ ভরত মহারাজ] বলেছেন : ''তখন [মঠে] খুব বড় বড় গাইয়ে আসত। তখনকার দিনে মঠে খুব উচ্চাঙ্গের গান শোনার লোক আসত। সেই আকর্ষণটা ছিল মহারাজের, তিনি কোনো জায়গাতে বসলে পরে সেটা জমে যেত। আর চারিদিকে বড় বড় যেসব গাইয়ে আছেন, particularly ঐদিনের জন্য অপেক্ষা করতেন। ... তারপর দেখলাম সত্যিই স্বামীজীর তিথিপুজোর আগের দিন সন্ধেবেলায় সব লোক আসছে, গাইয়েদের সঙ্গে মৃদঙ্গী-টিদঙ্গীও অনেক সব আসত। ঐ নিচেকার ঘরটাতে গানের আসর বসত। মহারাজ বসতেন ওখানে।... ওঁকে শুনিয়ে গাইয়েরা একটা আনন্দ পেতেন।... কী সুন্দর গান... ধ্রুপদ, উচ্চাঙ্গের গান সব... খোল-করতাল বাজিয়ে যে হরিনাম করা—ওরকম নয়। এক-এক জন করে গাইয়ে পরপর গেয়ে যাচ্ছেন। তখন মৃদঙ্গের কী বাজনা!''[৩৯]

ক্রমশ

তথ্যসূত্র

১৮। দ্রঃ শ্রীম-কথিত, *শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত*, উদ্বোধন কার্যালয়, ২০০১, অখণ্ড, পৃঃ ১১২৮

১৯। সংকলক ও সম্পাদক, স্বামী চেতনানন্দ, *স্বামী ব্রহ্মানন্দের স্মৃতিকথা*, উদ্বোধন কার্যালয়, ২০০৪, পৃঃ ১১ [এরপর, *স্মৃতিকথা*]

২০। দ্রঃ ব্রহ্মচারী অক্ষয়চৈতন্য, *ব্রহ্মানন্দ-লীলাকথা*, ক্যালকাটা বুক হাউস, কলকাতা, ১৩৯৫, পৃঃ ১৮৩ [এরপর, *লীলাকথা*]

২১। *স্মৃতিকথা*, পৃঃ ১৬১

২২। তদেব, পৃঃ ২৭৮-৭৯

২৩। তদেব, পৃঃ ৫০৯

২৪। স্বামী গম্ভীরানন্দ, *শ্রীমা সারদা দেবী*, উদ্বোধন কার্যালয়, ২০০১, পৃঃ ২১১

২৫। দ্রঃ স্বামী প্রভানন্দ, *ব্রহ্মানন্দ চরিত*, উদ্বোধন কার্যালয়, ২০১২, পৃঃ ২৫৬

২৬। *ধর্মপ্রসঙ্গে স্বামী ব্রহ্মানন্দ*, উদ্বোধন কার্যালয়, ১৯৯৬, পৃঃ ১৫৯

২৭। দ্রঃ Compiled and Edited by Swami Atmashraddhananda, *Swami Brahmananda as we saw Him*, Ramakrishna Math, Mylapore, 2010, p. 407 [এরপর, *Swami Brahmananda*]

২৮। তদেব, পৃঃ ৪৩৪

২৯। *ব্রহ্মানন্দ-লীলাকথা*, পৃঃ ৪৮-৪৯

৩০। তদেব, পৃঃ ৫২-৫৩

৩১। *স্মৃতিকথা*, পৃঃ ২৭৪

৩২। *ব্রহ্মানন্দ-লীলাকথা*, পৃঃ ১২৯

৩৩। *Swami Brahmananda*, p. 165

৩৪। সংকলক ও সম্পাদক স্বামী চেতনানন্দ, *প্রাচীন সাধুদের কথা*, উদ্বোধন কার্যালয়, খণ্ড ২, ২০১৯, পৃঃ ১১২-১৩ [এরপর, *প্রাচীন সাধুদের কথা*]

৩৫। *দ্রঃ ব্রহ্মানন্দ-লীলাকথা*, পৃঃ ১২৮

৩৬। দ্রঃ তদেব

৩৭। দ্রঃ *ব্রহ্মানন্দচরিত*, পৃঃ ২৫৬

৩৮। দ্রঃ *ব্রহ্মানন্দ-লীলাকথা*, পৃঃ ১২৮

৩৯। *প্রাচীন সাধুদের কথা*, খণ্ড ২, পৃঃ ৫৪৭-৪৮